আমাকে বলতে দাও
রমা কুন্ডু

‘‘কন্ঠ ক্ষীণ বেপরোযা তবু এ চীৎকার
আমার বলার অধিকার
শৃঙ্খলিত করেছিল যে–সকল নির্বোধ গোহয়ার
তাদের করেছে অস্বীকার’’

–৭৫–এর অন্ধকার দীর্ণ করে বাংলায় একটি কন্ঠ বেজে উঠেছিল। আজ তিনি তুঙ্গে। কিন্তু তার সেদিনের অসহ যন্ত্রণার শরিক কজন? ‘বড় আজব’ ‘বড় আজাদ’ যে লোকটা বলদ ‘‘ভাই মানুষকে শিকল পরিয়ো না, সে ফুল ফোটাবে’, তাকে যেদিন লোকে বলল ‘ওটা মানুষ নয় জিরাফ’ এবং ‘চিড়িয়াখানায় ভরে দিল’, তখনও তিনি প্রাণপণে ঘোষণা করে গেছেন, ‘দাসত্বের চেয়ে প্রিয়, মৃত্যুর মিছিল’? এবং ‘দাসত্ব নয়, দাসত্ব নয়, স্বাধীনতা।’ – তার এই সুতীব্র আকুতি কোনো আকস্মিক আবেগ নয়, তার সুদীর্ঘ বিবেকী সাংবাদিকদার এ এক স্বাভাবিক যুক্তি–সংগত পরিণতি। কারণ দীর্ঘদিন ধরে স্বনামে বা ছদ্মনামে গৌরকিশোর ঘোষের রচনা যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, হিংসার বিরুদ্ধে, গণতন্ত্রবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী অবিরাম ক্লান্তিহীন সংগ্রামে রত ছিল। সেই বিরামহীন লড়াই–এর সংহত প্রতিচ্ছবি আমাকে বলতে দাও।’

সত্তর–এর দশকের প্রথম পাঁচ বছরে এই বাংলায় ও শেষের দিকে সমগ্র দেশে যে বিচিত্র দ্রুতগতি পতন–অভ্যুদয়ের আবর্ত ঘুরে চলেছিল তার প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি উদ্যত করে রেখেছিলেন যে লেখক, ‘যুক্তি বুদ্ধি বিবেকের তেজ বিবেচনা’ ‘আর ভালোবাসা’–র পাঁচ বছরের অবিচ্ছিন্ন বিবেকী সাংবাদিকতার এক আণুবীক্ষণিক সংকলন – ‘আমাকে বলতে দাও’।

বইটির প্রথম লেখার প্রেরণা ‘ঘাতকের আস্ফালনে’, শেষ ‘শাসকের নিগ্রহে’। যে দুই প্রবল শক্তি সাধারণ হিসেবি মানুষকে চুপ করিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট, এই লেখককে তা দু:সাহসী প্রতিবাদে প্রবুদ্ধ করেছে। কিন্তু তিনি শুধু সংকট মুহূর্তেরই লেখক নন। সত্তর থেকে পঁচাত্তর–এই পর্বের প্রতিটি রাজনৈতিক বাঁক ও তার সামাজিক ফলশ্রুতি তিনি বুঝতে চেয়েছেন, কখনো আশায়, কখনো হতাশায়, ক্ষোভে, উদ্বেগে। কিন্তু কখনও অসাড়, নি:শ্চুপ হয়ে যাননি। প্রতিটি তাৎপর্যময় ঘটনা তাঁকে নাড়া দিয়েছে, ভাবিত করেছে। সেই ভাবনারই ফসল তাঁর এই লেখাগুলি? ‘আমাকে বলতে দাও’ তাই শুধুমাত্র একটি স্বাধীনতাপ্রিয়, সমাজ–সচেতন মনের অবিরাম যাত্রাই নয়, তা একই সঙ্গে–ক্ষুদ্র পরিসর সত্ত্বেও–সমসময়ের রাজনীতি–সমাজের একটা ইতিহাসও।

কোনো পুস্তক প্রসঙ্গে তাঁর সাহিত্যমূল্য, শব্দ ব্যবহার, তথ্য সন্নিবেশ, বিশ্লেষণশৈলী ইত্যাদি আলোচনার রেওয়াজ থাকলেও বর্তমান বইটির ক্ষেত্রে এসব প্রশ্ন অপ্রাসংগিক। যদিও কখনো বেদনায় মর্মস্পর্শী, কখনো কৌতুকে উজ্জ্বল লেখাগুলির ভাষা অতীব জোরালো ও স্পষ্ট–তবু এদের আসল আবেদন কখনোই সাহিত্যিক উৎকর্ষ নয়। শক্তিশালী লেখনীকে এখানে নিয়োজিত করা হয়েছে একটি

বিবেকী মনের সবল প্রকাশের জন্য– সেই বিবেকী ও সংগ্রামী মানসিকতাই এই বইয়ের মূল বক্তব্য, মূল আবেদন ও প্রধান উৎকর্ষ, যা তার নিজস্ব ঔজ্জ্বল্যে আর সব কিছু ম্লান করে দিয়েছে।

সত্তরের রক্তাক্ত সন্ত্রাসের দিনগুলিতে যখন ভীত, ন্যুব্জ মানুষ কোনমতে নিজের প্রাণটুকু হাতে করে পালিয়ে বাঁচতে ব্যতিব্যস্ত সেদিন গৌরকিশোর ঘোষ এগিয়ে এসেছিলেন তাঁর লেখনী সম্বল করে? ব্যাপক সামাজিক অন্যায় ও নিষ্ঠুরতার মধ্যে যখন 'আমরা সবাই একা বেঁচে থাকতে চাইছি' সেদিন তিনি খোলা চিঠিতে প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'একে কি বাঁচা বলে?' 'যে কোনও মূল্যে বেঁচে থাকার নামই কি বাঁচা? সকল রকম অপমান, নির্যাতন মুখ বুজে সহ্য করে শুধুমাত্র হৃৎপিন্ডের যন্ত্রটিকে ধুকধুক করে টিকিয়ে রাখার নামই কি বাঁচা?' সেদিন তিনি নাগরিকদের এই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন? কতটা সফল হয়েছিলেন সহজেই অনুমেয়। তবে আত্মগোপনকারী ঘাতকের চিঠি এসে পৌঁছতে দেরী হয়নি যাতে নকশালপন্থী তরুণেরা তাঁর মুখ বন্ধ করার প্রয়াসে প্রাণদন্ডের ফতোয়া দিয়েছিল? অসম সাহসে তাই পরম কৌতুকে সে চিঠি গ্রহণ করেছিলেন তিনি। কারণ ঃ 'মৃত্যুকে আমি শাস্তি বা দন্ড হিসাবে দেখিনা? তা আমার স্বাভাবিক পরিণতি.... বিবেক–বিরুদ্ধ কাজের দ্বারা আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হওয়াকেই আমি সাজা বা দন্ড মনে করি।' শুধু সন্ত্রাসকারীদের অন্যায়ের বিরুদ্ধেই নয়, যখন তাদের দমনের জন্য দ্বিতীয় সন্ত্রাস তৈরী হয়েছে তখনও প্রতিবাদে এগিয়ে এসেছেন তিনি? নকশালপন্থী সন্দেহে ধৃত তরুণদের উপর পুলিশের 'নির্বোধ পাইকারি নৃশংসতা'–র সূচনাতেই তিনি ধিক্কার জানিয়েছেন একজন গণতন্ত্রবাদী হিসেবে? কারণ রাজনৈতিক ক্ষিপ্ততা ও সন্ত্রাসবাদের সঙ্গেই তাকে রোখবার জন্য সৃষ্ট নতুন সন্ত্রাস –এর মধ্যে তিনি গণতন্ত্রের সমূহ বিপদ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেই অন্ধকার দিনগুলিতে–একদিকে রাজনৈতিক সন্ত্রাস অপরদিকে পুলিশী সন্ত্রাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'গনতন্ত্রের উপর আঘাত যেদিক দিয়েই আসুক, তৎক্ষণাৎ তাকে রুখবার জন্য যদি এগিয়ে আসতে না পারি তবে একদিন আমরা সন্ত্রাসবাদী শাসনব্যবস্থার দাসে পরিণত হব? যেদিন সি, পি, এম–এর হাতে নকশাল, নকশালের হাতে সি, পি, এম খুন হচ্ছে, দলীয় সংঘর্ষে শ্রমিক শ্রমিককে, কৃষক কৃষককে, ক্ষেত মজুর ক্ষেত মজুরকে আক্রমণ করছে সেদিন তিনি এই হত্যা ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সাধারণ নাগরিকদের শুভবুদ্ধি ও সাহস জাগানোর চেষ্টা করে গেছেন বিরামহীন। প্রবল বিশৃংখলা ও প্রতিকারহীন হিংসার মধ্যে কখনো কখনো তিনি বিষণ্ণ বিস্ময়ে ভেবেছেন মানুষের কেন এই অদ্ভুত অমানবিকতা। কিন্তু হাল ছেড়ে দেননি কখনো? যেদিন এক রক্তের নদী বয়ে যাবার পরেও 'রক্তপিপাসু রাজনীতির কাপালিকগণের শব–সাধনা'র আশা মেটেনি, সেদিন সেই বিভ্রান্ত অন্ধকারে একটি মানুষ আলো হাতে দ্বারে দ্বারে করঘাত করে ডেকে ফিরেছিলেন, 'কেউ জেগে আছো।' যখন হত্যা–নৃশংশতা–সন্ত্রাসের পথ বেয়ে আরো হত্যা–আরো নৃশংসতা আরো সন্ত্রাস ছুটে চলেছে অন্তহীন, যখন প্রতিটি বিপ্লবী দলের হাত রক্তলিপ্ত সেদিনও তিনি কী আন্তরিক আকুতি নিয়ে আবেদন জানিয়েছেন, আসুন, আমরা দেওয়ালে দেওয়ালে লিখি, এই রক্তের হোলি খেলা আর নয়। এবার আমরা সুস্থতায় ফিরি।"

এ অরাজকতার অবসানের জন্য একাত্তরের নির্বাচনের মুখে তিনি প্রকাশ্যে একটি একদলীয় স্থায়ী সরকার চেয়েছিলেন? পরবর্তী দিনে অরাজকতা রোধে নতুন সরকারের উদ্যোগকে তিনি সোৎসাহে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু সেই মুহূর্তেও তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন,

অরাজকতা দমনের অজুহাতে যেন গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব না হয়।

পরবর্তী কিছুদিনের লেখার মধ্যে লেখকের গঠনমূলক চিন্তার ছাপ সুস্পষ্ট। বুদ্ধিজীবীদের কাছে তিনি চেয়েছেন এক নতুন চিন্তা—বিপ্লবের নেতৃত্ব, যে বিপ্লবের উৎসমুখে থাকবে মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তা, বিজ্ঞানসিদ্ধ বিচার ও প্রগাঢ় মানবতাবোধ; গঠনমূলক চেতনা তৈরীর পটভূমি গড়তে পারে এমন বিপ্লবেই। তিনি শিক্ষিত মুসলমানদের কাছ থেকে আশা করেছেন, তাঁরা মুসলিম সমাজকে 'ভোটের হাটের পণ্য' হওয়া থেকে রক্ষা করবেন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা সংস্কার ও পল্লী সঞ্জীবনী চিন্তা যা আজও রীতিমত প্রাসঙ্গিক তাকে প্রয়োগ করতে চেয়েছেন আজকের সমাজে। বেসরকারী ও স্থানিক কর্মোদ্যোগের মাধ্যমে 'চিন্তার জড়তা' ও 'কর্ম সম্পর্কে নিষ্ক্রিয়তা' দূর করবার জন্য তিনি বলেছেন? এমন কি গোধন, খাদ্য—ভাবনা ও আমাদের তরুণদের অপুষ্টিরোধ সম্পর্কেও সহজ স্বচ্ছ চিন্তা ও প্রস্তাব দিতে তাঁর কোনো দ্বিধা নেই, তাতে যত সমালোচনারই ঝড় উঠুক। নতুন সরকারের কাছে তরুণদের কর্মসংস্থান সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট পরিকল্পনা তিনি তুলে ধরেছিলেন।

তবুও ৭২ সাল থেকেই লেখকের মনে একটা অস্বস্তির কাঁটা বিঁধছিল। যদিও ''সিদ্ধার্থ রায়ের প্রশাসন যতটুকু নিরাপত্তা এনেছে অতীতের বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ রেখে, তা আমি খোয়াতে রাজী নই'' তবুও ''কোনও ব্রুট মেজরিটির হাতে নিজের ভাগ্যকে অসহায়ভাবে সঁপে দিয়ে স্বস্তি পাইনে'' দেশের নতুন ক্ষমতাসীন যুবশক্তি সম্পর্কে আশাবাদী লেখক ভেবেছিলেন, 'দেশের গঠন যজ্ঞের তাঁরা হবেন নবীন পুরোহিত। তাঁদের প্রাণের জোয়ার প্রায় গতিহীন এই জাতির জীবনে গতিসঞ্চার করবে।' কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক সে আশা পূরণ হল না? তার বদলে ফণা তুলতে লাগল সর্ব্বনাশা আত্মকলহ। দুর্লক্ষণের সেই সূচনাতে লেখক সচেতন করতে চেয়েছিলেন এই যুবকদের: ''একটু ভেবে দেখবেন কি? চিন্তা থেকে, কর্ম থেকে, সেবা থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখে রাজদ্বারে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দাঁড়ালে স্বভাবতই বিরোধের সৃষ্টি হয়।...

জনসাধারণ এবং শিক্ষিত জনের মধ্যে সেতু—বন্ধনের প্রয়োজন উন্নতিশীল দেশে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য যত জরুরী, এত জরুরী কাজ আর কি আছে? এই মিলনসেতু রচনার উদ্যোগই একমাত্র আত্মঘাতী বিরোধের অবসান ঘটাতে পারে।''

এ আবেদন উদ্দিষ্টে পৌঁছায়নি। দলীয় কলহের হাত ধরে যেদিন নিচুতলার মস্তানরা আবার সমাজের খবরদারির দখল নিতে শুরু করল, সাধারণ মানুষরা ভয়সংকুচিত, সেদিন গৌরকিশোরকে আবার ফিরে আসতে হল তাঁর পুরানো সচেতকের ভূমিকায়, যিনি একদিন নিদ্রিত সমাজকে প্রাণপণে জাগাতে প্রয়াসী হয়েছিলেন? তিনি প্রশ্ন তুললেন, 'সাধারণ লোক আবার কেন অসহায় বোধ করতে শুরু করেছেন? উঁচুতলার রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে নিচুতলার পেশীবলের অবাঞ্ছিত মিলনে যে অস্বাস্থ্যকর অবস্থা সৃষ্টি হবে তার বলি গণতন্ত্র, একথা বলতে তিনি দ্বিধা করলেন না? 'আবার পাইপগানে'—র প্রত্যাবর্তন — 'আত্মঘাতী মুষল' নিয়ে যদুবংশীয় লড়াই তাঁকে ভীষণ বিচলিত করেছিল : ''এই সব যুবকেরা, স্বীকার করতেই হয়, একদিন তো নীতির জন্য, আদর্শের জন্য, প্রবল সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে লড়াই করেছেন। প্রাণ পর্যন্ত বিপন্ন করেছেন। এমন একদিন, যখন সহায় সম্বল বলতে এমন কিছু ছিল না।...তবে? আজ কেন এই উদ্‌ভ্রান্ত যুবকেরা ছিন্নমস্তার মত নিজের রক্তপানের জন্য এত উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন।''

সদর্থক কর্মসূচীর অভাবে বিপুল যুবশক্তি যে আত্মঘাতে অপচয় হয়ে গেল তার জন্য লেখক গভীরভাবে ব্যথিত ও হতাশ হয়েছিলেন।

এই সময়েই পাশাপাশি জাতীয় রাজনীতির কতগুলি প্রবণতা তাঁকে শঙ্কিত করে তুলছিল? ৭৩—এ তিনজন প্রবীণতর বিচারপতিকে ডিঙিয়ে এ. এন, রায়কে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি করা হলে লেখক তাকে স্বাগত জানাতে পারেননি? তাঁর মনে হয়েছিল মন্ত্রিসভার মনোমত প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করে সুপ্রীম কোর্টকে সংসদের ইচ্ছা—অনিচ্ছার অধীনে অবনমিত করা হল, যে সংসদে ক্ষমতাসীন দলের নিরঙ্কুশ আধিপত্য, এবং সে দলে প্রধানমন্ত্রীই শেষ কথা? গভীর শংকায় সেদিন তিনি বলেছিলেন, 'সমাজতন্ত্রের নামেই গণতন্ত্রের সমাধি রচনার কাজ চলেছে?'বলেছিলেন যে দেশে সরকারের হাতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা গিয়ে জমে, সে—দেশে গণতান্ত্রিকতাই আসবাবে পরিণত হয়? তাকে দিয়ে ঘর সাজানোই চলে, তার বেশি কিছু নয়।' তাঁর ভয় হয়েছিল, এই প্রচন্ড ক্ষমতাশালী প্রশাসনের কোনো স্বেচ্ছাচারই আর কারো পক্ষে নিবারণ করা সম্ভব নয়।

তাঁর এ আশংকা সত্যে পরিণত হতে বেশী সময নেয়নি? ২৬ জুন, ১৯৭৫ এর পরবর্তী তাঁর স্বল্প এবং অতি বাঙ্ময় যে লেখা কটি এ সংকলনে উপস্থিত, সেই আশ্চর্য লেখাগুলি সম্পর্কে বাঙালী পাঠকের কাছে নতুন করে কিছু বলা সম্ভবত: বাহুল্য। অন্তরমন্থন করে তুলে আনা এই লেখা কটি সূক্ষ রন্ধ্র পথে প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মত সেদিন অসংখ্য মূক বাঙালীকে কীভাবে আঘাত করেছিল লেখক হয়ত নিজেও জানেন না। অন্তত: এই কটি লেখা তাঁকে কাস্ত্রোর সেই বিখ্যাত জবানবন্দীর মত, সোলঝেনিৎসিনের আশ্চর্য চিঠিগুলির মত, কালজয়ী করেছে।

'আমাকে বলতে দাও'—এর লেখাগুলি মূলত: তিনটি বিষয় – স্তম্ভের উপর প্রসারিত : সন্ত্রাসের প্রতিরোধ, সমাজগঠন ও স্বাধীনতার লড়াই – বিভিন্ন ঘটনা ও প্রসঙ্গ মূলত: এই তিনটি ধারায় তাঁর চিন্তাকে প্রবাহিত করে দিয়েছে? সে সব ঘটনা আজ অবশ্যই অতীত? তবুও একথা বলা যাবে না লেখাগুলি আজকের দিনে অপ্রাসঙ্গিক? সমাজগঠন সম্পর্কিত নিবন্ধগুলির তাৎপর্য আজও সমান স্বীকার্য। সন্ত্রাসের দিন সম্ভবত: আবার সমাগত? আর স্বাধীনতার লড়াই—এর প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে একথা নিশ্চযই কোনো যুক্তিবাদী বলবেন না।

কিন্তু লেখার বিষয়বস্তুর চেয়ে অনেক বড় কথা 'আমাকে বলতে দাও' —এর স্পিরিট। গৌরকিশোরের সব বক্তব্যের সঙ্গে পাঠক একমত না হতে পারেন। তাঁর বক্তব্য—উপস্থাপনা নিয়েও দ্বিমত থাকতে পারে? কারণ তিনি প্রথাসিদ্ধ প্রাবন্ধিকের প্রচলিত ধীর পথে না গিয়ে প্রায়শ:ই তাঁর যুক্তির শাণিত তরবারিকে তীব্র আবেগের ক্ষিপ্রতায় সরাসরি পাঠকের মনে গেঁথে দেন। কিন্তু তাঁর এ সংকলনের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট এর স্পিরিট—প্রতিটি লেখার মধ্যে একটি যুক্তিবাদী নির্ভীক মন কথা বলে উঠেছে—যার কাছে সময় – অসময়ের পাটোয়ারী হিশেব তুচ্ছ—তুচ্ছ ঘাতকের আস্ফালন, শাসকের নিগ্রহ? এক বিরাট হৃদয় বিবেকবান মানুষের নির্ভীক অভিব্যক্তি যে কোনো পরিস্থিতিতে—যা সাধারণ পাঠককেও ভাবতে বাধা ক'রে সে কি তার কর্তব্য পালন করেছে?

—এইখানেই সম্ভবত: বইটির শ্রেষ্ঠ সাফল্য।